সংগঠিত শিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার পাটশিল্পের সামগ্রিক চিত্র ১৯৮০-২০২০

পি.এইচ.ডি (কলা) উপাধি-র জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্ধর্ভ

(সারসংক্ষেপ)

গবেষক

বিশ্বরূপ প্রামাণিক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর. : D-7/ISLM/86/16

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ইমনকল্যাণ লাহিড়ী

মানবীবিদ্যা চর্চাকেন্দ্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

ভূমিকা

উপক্রমণিকা

অবিভক্ত বাংলায় যে শিল্পগুলি প্রধান সারিতে ছিল, তাদের অন্যতম হল পাটশিল্প। গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে পাট পাওয়া গেলেও অবিভক্ত বাংলায় (ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) পাটের রমরমা ছিল সবচেয়ে বেশি। মূল কারণ নদীমাতৃক বঙ্গদেশের পরিবেশ পাটচাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী ছিল, ফলে ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে আসা ব্রিটিশরা আজ থেকে ১৫০ বছর আগে পাটশিল্পের পত্তন করেন এবং তখন থেকেই সব ধরণের জিনিষ এমনকি খাদ্যশস্য সারা পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হত পাটের তৈরি ব্যাগ।[১] পাটশিল্প বাঙালী জনজীবনের এক অন্যতম সম্পদ। পাটশিল্পকে আশ্রয় করে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, যা বাঙালীর বহমান ইতিহাসের অন্যতম সঙ্গী। বাংলার সাহিত্যে, বাঙালীর মননে পাটশিল্প এক বিশেষ মূলধন, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য।[২] কিন্তু আজ সেই পাটশিল্প বিপন্ন।

বলা বাহুল্য, অবিভক্ত বাংলায় পাট ব্যবসার প্রসিদ্ধি ছিল বিশ্ব জুড়ে। দেশভাগের পর এ রাজ্যেও পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বছরে গড়ে ৮০ থেকে ৮২ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয় এই রাজ্যে।[৩] মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, মালদা, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, দার্জিলিং ও হাওড়া জেলার কিছু অংশে পাটচাষ হয়। ৪০ লক্ষ মানুষ পাটচাষের সঙ্গে যুক্ত।[৪] বিদেশী মুদ্রা অর্জনে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিপুল চাহিদা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ব্রিটিশ আমলে পাটচাষ হত মূলতঃ বাংলাদেশে, কিন্তু চটকলগুলি স্থাপিত হয়েছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার অববাহিকায়, মূলতঃ দক্ষিণবঙ্গে। দ্বিখণ্ডিত, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পাটচাষ আরম্ভ হয় এবং বহু জায়গাতেই কৃষকরা পাটচাষ করে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়। ফলত পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার চটকলগুলির স্বার্থে কৃষককে পাট চাষের জন্য উৎসাহিত করেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

গড়ে ওঠে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জুট শিল্পকে আরও উন্নত পর্যায়ে উন্নিত করা কারণ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বিষয় ছিল পাট রপ্তানী।[৫]

বলা বাহুল্য সারা বিশ্বে স্বীকৃত চট ও ফাইবার বায়ো-ডিগ্রেডিবল ও পরিবেশ বান্ধব। একথা সকলেরই জানা আছে যে চটশিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে এটা কৃষিভিত্তিক (Agro Based) শিল্প, শ্রমনিবিড়, বায়ো ডিগ্রেডিবল ও পরিবেশ বান্ধব এবং রপ্তানী যোগ্যও বটে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ৪০ লক্ষ পাটচাষী ও ২.৫০ লক্ষ শ্রমিক, স্বনিযুক্ত হস্তশিল্পী এবং পরোক্ষভাবে আরও বহু শ্রমজীবী মানুষ, এ রাজ্যে, এর উপর নির্ভরশীল।[৬] আমাদের রাজ্য ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বহু মানুষ এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত।

সারা দেশে Composite Jute Mill হচ্ছে ৮৩ টি।[৭] এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৬৪টি, বর্তমানে তার মধ্যে ৪৯ টি চালু আছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ৭টি, বিহারে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি, আসামে ২টি, উড়িষ্যায় ১টি, ছত্রিশগড়ে ২টি এবং ত্রিপুরায় ১টি। দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ৮৩ টি চটকলে চটের উৎপাদনের পরিমাণ ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন।[৮] এই বিপুল উৎপাদনের মধ্যে গৃহস্থ জীবনে ব্যবহৃত হয় সাকুল্যে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন চট। তাছাড়া, প্রতি বছর গড়পড়তা ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টন চট রপ্তানী হয়। পড়ে থাকা ১৭ লক্ষ টন চট "জুট প্যাকেজিং আইন"- এর মাধ্যমে রেশনে খাদ্যদ্রব্য বন্টন ও চিনির প্যাকিং-এ ব্যবহৃত হওয়ার কথা।[৯] কিন্তু বাস্তবে চটের ব্যবহার ক্রমাগত নিম্নমুখী, যদিও নির্বাচনের সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই পাট-শিল্পকে ঘিরে নানা প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী অধ্যায়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

ইংরেজ আমল থেকে সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থাতে কৃষক ছিল জমি-হীন ক্ষেতমজুর। জমিদারের অত্যাচারে প্রায়শই ক্ষেতমজুররা গ্রামছাড়া হত আর তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল নবনির্মিত চটকল। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মহেশ" নামক ছোটগল্পটি তার এক অনন্য উদাহরণ। সর্বস্বান্ত রহমৎ গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে তার ছোট মেয়ে আমিনার হাত ধরে উলুবেড়িয়ার চটকলের দিকে পা বাড়িয়ে ছিল, কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য।[১০] এইভাবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও সুদূর দক্ষিণ

থেকেও জমিহীন কৃষক কাজের সন্ধানে চটকলে শ্রমিকে পরিণত হত। চটকলে কাজ করে সর্বস্বান্ত কৃষকরা সর্বহারা শ্রমিকে পরিণত হত। তাদের না আছে কোন ভবিষৎ, না আছে বেঁচে থাকার সুখ। সাম্প্রতিককালে চট শ্রমিকদের সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রামে আজ পাটচাষও সঙ্কটের মুখে কারণ জলের অমিল। সবদিক থেকেই এক গভীর সঙ্কটের আবর্তে পাটচাষ ও চটশিল্প। শিল্পায়ন নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, সভা হচ্ছে, বিদেশে যাতায়ত হচ্ছে মন্ত্রী আর আমলাদের, কিন্তু শিল্পমেলা বা শিল্প সংক্রান্ত সভাতে চটকলের সমস্যাটি ব্রাত্যই থেকে গেছে।

"কিয়োটা প্রটোকল" স্বাক্ষর হওয়ার পরে শিল্পের জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য সম্পদের (Renewable Resources) ব্যবহার শুরু হয়েছে।[১১] বৃক্ষের 'লিগনোসেলুলজিক ফাইবার'কেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পাটগাছ মাত্র ১২০ দিনের মধ্যে হেক্টর প্রতি প্রায় আড়াই টন লিগনোসেলুলজিক ফাইবার উৎপাদন করে। গোটা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লাখ হেক্টর জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হয় এবং এ থেকে প্রায় ৩৫ লাখ টন ফাইবার উৎপাদন হয়। এক হেক্টর জমিতে চাষ করা পাটগাছ মাত্র ১২০ দিনের মধ্যে বায়ুমন্ডল থেকে প্রায় ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রায় ১১ টন অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়।[১২] অনেক বনবৃক্ষের তুলনায় পাটগাছের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের ক্ষমতা বেশি।

এছাড়া, পাটের চাষ প্রতি বছর জমিতে প্রায় ৫৪.৩ লাখ টন শুকনো পাতার যোগান দেয়, যার ফলে মাটিতে মোট ১,৬৮,৭৫০ টন নাইট্রোজেন, ৫৬,২৫০ টন ফসফরাস এবং ১,৫০,০০০ টন পটাসিয়াম যোগ করে।[১৩] এ থেকে ফসল চাষে সারের খরচ যতটা বাঁচে তাকেও পাটের কার্বন ক্রেডিটের মূল্য বলে ধরা যায়।

নবায়নযোগ্য পাটকে কাগজ তৈরির বিকল্প কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে- এক টন পাট থেকে তৈরি ব্যাগ পোড়ালে ২ গিগা জুল তাপ এবং ১৫০ কেজি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হয়, অন্যদিকে এক টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে ৬৩ গিগা জুল তাপ এবং ১৩৪০ টন কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুতে প্রবেশ করে।[১৪]

ইউরোপ সহ আমেরিকায় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু তা সত্বেও বস্তুত: প্রত্যেক মাসেই দু-একটি চটকলের গেটে তালা ঝুলছে। কারণ চটকলের বর্তমান মালিকরা পাটশিল্পকে উন্নত করার কোনরকম চেষ্টা তো করেনই না উপরন্তু অব্যহত রেখেছেন মধ্যযুগীয় শ্রমিক শোষণ। ফলত: রাজ্যের সামগ্রিক শিল্প পরিস্থিতি প্রশ্নের মুখে। তবে এ রাজ্য থেকে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর বহর কিন্তু দিন দিন বাড়ছে। কারণ পাটজাত পণ্যের কদর দেশের তুলনায় বিদেশে অনেক বেশি। বিদেশে পরিবেশ সচেতনতা বেশি হওয়ার দরুণ প্লাস্টিক ছেড়ে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারে ঝোঁক অনেক বেশি।

গবেষণা ফাঁক বা গ্যাপ:

বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনায় এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট যে, পাটশিল্পের সাথে যুক্ত অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের বিষয়ে আলোকপাত লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিক 'মহিলা' বর্গ পরিচয়ের ভেতরেই যে সব ক্ষুদ্র বর্গ পরিচয় যেমন- 'তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শ্রমিক' বা 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা শ্রমিক' 'সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলা শ্রমিক', 'গ্রামের মহিলা শ্রমিক' বা 'শহরের মহিলা শ্রমিক' এবং সর্বোপরি 'পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিক' প্রভৃতি শ্রমিক পরিচয় ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। পাশাপাশি পাটশিল্পের সাথে যুক্ত অসংগঠিত মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের বিষয়ে জাতীয় স্তরে বেশ কিছু গবেষণা হলেও তার ক্ষুদ্র পরিসর যেমন আঞ্চলিক এবং রাজ্য বা জেলা স্তরে এবিষয়ে গবেষণায় শূন্যতা আছে। সে কারণেই বর্তমান গবেষণায় হুগলী জেলার পাটশিল্পের সাথে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃতি কিরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই বর্তমান গবেষণা উপস্থাপনা।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- হুগলী জেলার প্রান্তিক অসংগঠিত পাটশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচারে শ্রমিক অধিকার সচেতনতার প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।
- হুগলী জেলার পাটশিল্পের তপশিলি জাতির অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনার রূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।

- হুগলী জেলার পাটশিল্পের তপশিলি জাতির মহিলা ও পুরুষ অসংগঠিত শ্রমিকদের রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতার প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।
- হুগলী জেলার পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বাধা গুলি কি তা অনুসন্ধান করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণার প্রয়োজনে গৌণ উপাত্ত হিসাবে বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ, জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, আদমশুমারি রিপোর্ট, জেলা ভিত্তিক সরকারী তথ্য পুস্তিকা, সরকারী নথিপত্র, ডিসট্রিক্ট গেজিটিয়ার, প্রকাশিত আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র, গবেষণার বিষয় অনুসারী বিভিন্ন অন-লাইন প্রকাশনা প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তারপর যে সকল তথ্য প্রাপ্তি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা হয়েছে। একই সাথে ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফলকে যাচাই করা তথা ফলাফলকে সূক্ষ্মভাবে অনুধাবনের জন্য কিছু ঘটনা অনুধ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঘটনা অনুধ্যানের ক্ষেত্রে হুগলী জেলার স্থানীয় পাটকলের বিভিন্ন স্তরের সংগঠিত ও অসংগঠিত মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের, পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-কমিশনের থেকে প্রাপ্ত আইনি অধিকার, এবং বিভিন্ন তপশিলি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা শ্রমিক, পুরুষ শ্রমিক, শিশু শ্রমিক, সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাটশিল্পের ঘটনা অনুধ্যানের আওতায় রাখা হয়েছে।

গবেষণার কালপর্ব:

গবেষণার কালপর্ব হিসাবে ১৯৮০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত হুগলী জেলার তথা পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষত মহিলা ও শিশু শ্রমিক, তপশিলি জাতিভুক্ত শ্রমিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রমিদের রাজনৈতিক চেতনা, অধিকার সচেতনতা ও আন্দোলনে অংশগ্রহন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কালপর্বে ১৯৮০ সালকে নির্দিষ্ট করা হল এই কারণে যে, অসংগঠিত শ্রমিকদের বিশেষত পাটশিল্পের সাথে যুক্ত থাকা সুবিপুল মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের অধিকার আন্দোলনের সুযোগ বাড়ে ‘বিশ্বায়নের’ ফলে। পশ্চিমের দেশে উদার অর্থনীতির সুত্রপাত, ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে

ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ১৯৯১ সালে ভারতে উদার অর্থনীতি গ্রহণ করার পর বিভিন্ন উৎপাদনই ক্ষেত্র গুলি থেকে বিপুল পরিমাণে শ্রমিক ছাঁটাই হতে শুরু করে। এমনকি সংবিধান স্বীকৃত শিল্প আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের উপর জুলুম নামিয়ে আনলে। শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষন থাকা শর্তেও বিপুল পরিমাণে বকেয়া রাখে ই.এস.আই., পি.এফ- এর টাকা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে পাটশিল্পের সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক অধিকার আদায় করতে কতখানি সচেতন এবং তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শ্রমিক, ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রমিক রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণের প্রকৃতিই বা কেমন। সর্বোপরি পাটশিল্পের সংগঠিত অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবনের গতি প্রকৃতিই বা কেমন তা দেখাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণা এলাকা:

বর্তমান গবেষণার ভৌগোলিক এলাকা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম সিমান্তের অন্যতম জেলা হুগলী জেলাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়কাল:

গবেষণা তথা ক্ষেত্র সমীক্ষার এলাকা যেহেতু সমগ্র হুগলী জেলা, এই বিশাল ভৌগোলিক এলাকার অধীন প্রত্যন্ত গ্রাম, মফঃস্বল টাউন, জেলা শহরের মতো বিস্তীর্ণ এলাকা ও উক্ত এলাকার সদর চন্দননগরের গোন্দোলপাড়া পাটশিল্পের শ্রমিকদের সাথে কথা বলে নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করতে বেশ কিছুকাল সময় লেগেছে। সমগ্র জেলার পাটশিল্পের অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে।

প্রথম অধ্যায়

পাট-মজুরের সালতামামি

স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বাংলায় পাটশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যা দশকের পর দশক জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানকে একসময় সুনিশ্চিত করেছিল। পরিবেশবান্ধব হিসেবে পাটের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না এবং সেজন্যই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতবর্ষ ছাড়াও নেপাল, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ-মায়ানমার সহ বিভিন্ন দেশে এই শিল্পের বিস্তার ঘটে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীব্যাপী পাট-শিল্পের সাথে যুক্ত আনুমানিক প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ যার মধ্যে প্রত্যক্ষ শ্রমিক ছাড়াও রয়েছেন পাটচাষি এবং পাট-কেন্দ্রিক অনুসারী শিল্পের সাথে যুক্ত থাকা অসংখ্য মানুষ। ভারতবর্ষ পাটজাত পণ্য-দ্রব্যের সারা দুনিয়া জুড়ে সর্ববৃহৎ উৎপাদক। ৭০ শতাংশ উৎপাদন এই উপমহাদেশেরই ফসল।[১৫]

১৯৯৬ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষের জুটমিলের সংখ্যা ৯৩টি যার মধ্যে ৫৯টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। 'জুট কমিশনারেটের' হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন থেকেছে বার্ষিক প্রায় ১৫৪৬.৮২ হাজার মেট্রিকটন।[১৬] রপ্তানি বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। ২০১৪-২০১৫ সালে পাটশিল্পকে কেন্দ্র করে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮১৩.৮ কোটি টাকা।[১৭] আন্তর্জাতিক বাজারের পতন সত্বেও চটশিল্প তার ধারাবাহিকতা রেখেছে মূলত অভ্যন্তরীণ বাজারকে কেন্দ্র করে। যদিও এই অভ্যন্তরীণ বাজারের বৃদ্ধিতে সরকারের দাক্ষিণ্য অনেকটাই। ১৯৪৯-১৯৫০ এ পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল দশ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকে এই পরিমাণ পৌঁছায় ৮৬.২৭ শতাংশ। পরিমাণের দিক থেকে ১৯৪৮ সালের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল ১,৩১,০০০ টন। ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১,৩,৮৭,০০০ টন।[১৮] এর কারণ হিসেবে বলা যায় দেশের শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের প্রসারণ ও 'প্যাকেজিং আইটেম' হিসেবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি। অভ্যন্তরীণ বাজারের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সরকার। 'এফ.সি.আই' কেনে 'বিটুইন-ব্যাগ',

'পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ' কেনে 'জুট টোয়াইন' ও অন্যান্য ব্যাগ। একসময়ে 'ফার্টিলাইজার অফ সিমেন্ট' শিল্প অনেক জুট-ব্যাগ কিনত! কিন্তু এখন তার পরিমাণ দ্রুত কমছে।

সস্তাশ্রম এবং সুলভ কাঁচামালের সূত্রে ব্রিটিশরাই মূলত ১৯৪৭ এর পূর্ব পর্যন্ত পাটশিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল। কলকাতার অদূরে 'রিষড়াতে' ভারতবর্ষে প্রথম জুটমিল স্থাপিত হয়।[১৯] কোন ধরনের শ্রম আইন এবং সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত না থাকায় পাটশিল্পর এক দ্রুত লাভজনক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৪ সালে পাটশিল্পের মালিকরা পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ও নিজেদের সংগঠিত করার মাধ্যম হিসেবে "ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন" গড়ে তোলে। এই সংগঠনই ১৯০২ সালে ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৩১ সালে 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট'- এর মাধ্যমে তা নথিবদ্ধ হয়।[২০] ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ মালিকানাধীন পাটশিল্পের হস্তান্তর ঘটে এবং মূলত ভারতীয়রা এই শিল্প উদ্যোগের সাথে যুক্ত হয়। মূলত দুটি কারণ এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রথমত: যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সূত্রে মুনাফা দুর্নীতি ও মজুতদারির মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: ব্রিটিশ অর্থনীতি ও ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের অনিশ্চয়তা এই শিল্পে ভারতীয়দের প্রবেশকে সুগম করে।

যদিও এরা কেউই স্বাধীন শিল্পপতি ছিলেন না ছিলেন পাট ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের 'ভাগ্যান্বেষী' ও 'মধ্যস্বত্বভোগী' অতি দ্রুত লাভের ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে যারা পাট-শিল্পকে দেখতে শুরু করে। পাট-শিল্পের শ্রমিক সংখ্যার ক্রমাবনতির সূচনা পর্যায় এই সময়ই।

পাট-শিল্প স্থাপনের একেবারে শুরুর পর্যায়ে বাঙালি শ্রমিকদের আধিক্য থাকলেও শিল্প সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে ভিড় করতে লাগলেন তারা যারা বেশিরভাগই মূলত বিহার উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশ থেকে আগত; গ্রামে যাঁদের একখণ্ড জমি রয়েছে এবং একইসাথে কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত ও উদ্বৃত্ত না হওয়ায় বাধ্য হয়ে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন পাটশিল্পে। ১৯২৯ সালের

যে হিসাব আমরা পাই তাতে দেখা যায় মোট শ্রমিকের চব্বিশ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ, তেত্রিশ শতাংশ বিহার, তেইশ শতাংশ উত্তরপ্রদেশ, দশ শতাংশ ওড়িষ্যা, চার শতাংশ তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ তিন দশমিক তিন শতাংশ; এছাড়াও অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছেন।[২১] সত্তরের দশক পর্যন্ত যে হিসেব দেখা যায় তাতে এই শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। বর্তমানে যদিও পাটশিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা এক হাজারেরও কম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাটশিল্প শ্রমিকদের পরিচিতি স্বত্ত্বা ও সামাজিক সংহতির ক্ষেত্র

প্রায় ৭০ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত সুধীর কুমার মিত্রের রচনা "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে সেই সময়ের যে খণ্ড চিত্র পাওয়া যায় আজও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সুধীর কুমার লিখেছেন সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে "মিল এলাকা ছাড়া অন্য স্থানগুলি খুব পরিষ্কার রাখা হয় না বলিয়া মধ্যে মধ্যে অসুখের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রধান রাস্তা 'গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক' রোড এই রাস্তার গা দিয়া যেসব শাখা রাস্তাগুলি আছে সেই গুলি অপ্রসস্ত এবং ধূলি ধূসরিত এই সব রাস্তার দুই ধারে গভীর কাঁচা অপরিষ্কার নর্দমা পৌরসভার কলঙ্ক পরিমার্জনের অভাবে নর্দমা হইতে দুর্গন্ধ ও জল নিষ্কাসনের অব্যবস্তার জন্য পেটের অসুখের প্রাদুর্ভাব এই স্থানে প্রায়ই হয়"।[২২]

হুগলী জেলায় গোন্দলপড়া জুটমিল, ভিক্টোরিয়া, নর্থব্রুক জুটমিল অধ্যুষিত তেলিনিপাড়া এলাকায় চটশিল্প ও অন্য কারখানায় কাজ করতে আসা হিন্দি ও উর্দূভাষী মানুষ এসেছেন মূলত ব্রীটিস শাসন কালে। তেলিনি পাড়ার মিশ্র জনবস্তিতে উক্ত দুই ভাষা ভাষী মানুষ আছেন বহুলাংশে। এছাড়া ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপালটি এলাকায় উড়িয়া তেলেগু ইত্যাদি ভাষার মানুষ আছেন। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে দ্বগ্ধ হয়েছেন এখানকার মানুষ।[২৩] প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দিভাষী বনাম উর্দূভাষী এই সমীকরণ উঠে এসেছে।

তবে সাম্প্রতিক অতিতে গোন্দল পাড়া-তেলিনি পাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার সাম্প্রদায়িক হিংসার যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা অতিতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। এবারের তেলিনি পাড়ার বিশেষত্ব হল দাঙ্গার বিস্তৃতি; এলাকা ও জনগোষ্ঠীর নিরিখে। বাংলাভাষীরাও সাম্প্রদায়ীক হিংসায় যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। সংগঠিত ও বহিরাগত দাঙ্গাবাজ এনে সুপরিকল্পিত ভাবে হিংসার চাষ হয়েছে এই পর্যায়ে।

ভিক্টোরিয়া বা গোন্দলপাড়া জুটমিল সংলগ্ন এলাকায় কূড়মালি, ভোজপুরির মতো আঞ্চলিক হিন্দি ভাষী গরীব মানুষ, ঐতিহ্যগত ভাবে উর্দূভাষী (অধুনা হিন্দি ভাষী) সম্পন্ন মুসলিমরা, বা দরিদ্র হিন্দি ভাষী মুসলিম, ঘাটাল ব্যবসায়ে যুক্ত থাকা বড়

সংখ্যার হিন্দি ভাষী গোয়ালা, দর্জীর কাজে যুক্ত বা ছোটো অস্থায়ী চাকরী করা হিন্দু বা মুসলিম মানুষ যারা প্রায় অধিকাংশই তিন প্রজন্মের বেশি এখানে কাটিয়ে ফেলেছেন। মহল্লা অনুযায়ী স্থানীয় মানুষের মধ্যে যেমন একটি বিভাজন চালু আছে হিন্দু মুসলিম আর বাঙালী। শ্রমিক মহল্লার বাইরে গ্রান্ড ট্যাঙ্ক রোডের উপরে মধ্যবিত্ত্ব শিক্ষিত চাকুরিজীবী বাঙলা ভাষীরাই বাঙ্গালী। তাঁরা অতিত থেকেই হিন্দি ভাষী দলিত হিন্দুদের থেকে এক পৃথক স্বত্ত্বা হিসেবে রয়েগেছেন। এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক হিংসার হেতু খুঁজতে গেলে জনবিন্যাস আর সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে উপলব্ধি না করলে অনেক কিছু অসম্পন্ন থেকে যাবে।

বাংলার মূসলিম আমলে বড়ো অংশ অবাঙালী মূসলিম প্রথমে ভদ্রেশ্বর ও পড়ে অনান্য অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। স্বাধীনতার আগে ও পড়ে এলাকার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে করায়ত্ত্ব করে সাহু, তিয়ারী, আগারওয়ালরা। জলপথে কাঁচামাল পরিবহণের সুবিধার জন্যে অবিভক্ত নদীয়া ও মূর্শিদাবাদ জেলার পাটের উপর ভরসা করে গড়ে ওঠে চটকলগুলি। শ্রমিক হিসেবে কাজ করে পার্শ্ববর্তি রাজ্যগুলি থেকে গরীব ও দলিত মানুষরা আসেন দলে দলে; নদীর তীরবর্তি মিল লাগোয়া অঞ্চলে বসতি, শ্রমিক মহল্লা গড়ে ওঠে এখানে যাকে "লাইন" বলা হয়।[২৪] স্বাধীনতা পরবর্তি কালে বাম শ্রমিক আন্দোলনের অনেক সক্রিয়তার স্বাক্ষী হুগলী নদীর দুই তীরের জুটমিল গুলো। কিন্তু সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হিংসার পরে অথ্যনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে শ্রমিক মহল্লার নূন্যতম জীবন ধারণের সুবিধা গুলোর দিকে যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন ও যেমন একদিকে ভূমিকা পালন করেনি তেমনই পৌর স্বাচ্ছন্দ অবহেলিত থেকেছে। পানীয় জলের সমস্যা দূর্বিসহ নিকাশি ব্যবস্থা স্বাস্থের মত বিশয়ের সুরক্ষার কথা উঠলে ধর্ম নির্বিশেষে মহল্লার বাসিন্দারা ক্ষোভ জানিয়েছেন কিন্তু প্রতীকার সূত্র মেলেনি।

তৃতীয় অধ্যায়

সরকারী কার্যাবলী

আমরা এখন চটশিল্পের মন্দার কারণগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলাম। এবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে চটের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কী ভূমিকা নিয়েছিল আমরা তা দেখার চেষ্টা করব।

১। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মূল পাট চাষ কেন্দ্রগুলি অধুনা বাংলাদেশের মধ্যে চলে যায়, ফলতঃ পাট চাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সরকার কিছু প্রচেষ্টা চালায়। প্রথমতঃ আউশ ধান চাষের বদলে পাট চাষকে উৎসাহিত করা হয়। তা করতে গিয়ে ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে চাল উৎপাদন হলে সেই ক্ষেত্রে চালে ভর্তুকি দেওয়া হত। এর ফলে কাঁচা পাটের চাষ বৃদ্ধি পায়। পাট চাষের জমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬-এর মধ্যে বৃদ্ধি পায় পশ্চিমবঙ্গে তিনগুন, আসামে দুই গুন পর্যন্ত।[২৫] পরবর্তী কালে সরকারি নীতি বদলে যায়, আউশ চাষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং এক ফসলি জমিতে যেখানে কেবলমাত্র আমন চাষ হয় সেখানে আমন চাষের আগে পাট চাষ শুরু করা হয়।

২। কাঁচা পাটের গুনগত মানের উন্নতি ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি যেমন একটি সমস্যা তেমনি সমস্যা হল মূলধনের অভাব ও যথাযথ বাজারজাতকরণ। এই সমস্যাগুলি নিরসনে সরকারি ভূমিকা কী এবং এর সার্থকতাই বা কতটুকু? কাঁচা পাটের গুনগত মানের উন্নতি ও একর-প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গবেষণার স্তরে কিছু কাজ হলেও বাস্তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার অভাব বিশেষভাবে দেখা যায় –এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে "ইন্টারন্যাশনাল জুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" (আই.জে.ডি.পি) চালু হয় ১৯৭২-৭৩ সালে।[২৬] কিন্তু তার লক্ষ্য যা ছিল তা পূরণ হয়নি– অবস্থা এমনটাই খারাপ যে পাট চাষের জন্য সরের যে মাত্রা ঠিক হয় তা আই জে ডি পি অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ হয় না।

পাট চাষের ক্ষেত্রে প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যাই বেশী। স্বাভাবিকভাবে মূলধনের অভাবটিই চলে আসে। এই ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা খুব বেশী দেখা যায় না। চাষীদের মোটামুটিভাবে নির্ভর করতে হয় ব্যবসায়ী বা মহাজনদের ওপর। দাদন নিয়ে অল্প দামে

তাদের কাছেই মাল বেচে দিতে হয়। ফলতঃ চাষীরা আশাব্যঞ্জক দাম পায় না। মূলধন সরবরাহের যথাযথ ভূমিকা সরকার পালন না করলেও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা নেয়- "জুট করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া" (জে.সি.আই) তৈরি করার মাধ্যমে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালে।[২৭] এর মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্ট দামে বাজার থেকে পাট কিনতে থাকে। কিন্তু কর্পোরেশন কাজ করতে থাকে ভীষণ নীচু তারে- প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ১৫ বছরের মাথায় বাজারে আসা কাঁচা পাটের মাত্র ২৪% কিনছে (১৯৮৫-৮৬) সালের সময় পর্বে। কো-অপারেটিভ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাও জে.সি.আই– এর ব্যর্থতার সাথে যুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রের তূলা চাষের ক্ষেত্রে কিন্তু কো-অপারেটিভগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত জে সি আই প্রায় কোনো কাজই করেনি। ১৯৯৭-৯৮ সালে জে সি আই কাঁচা পাট কেনে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার বেল, যেখানে ১৯৮৫-৮৬- তে এর পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ বেল, ১৯৮৬-৮৭-তে ২২ লক্ষ বেল।[২৮] জে সি আই-এর কর্মপদ্ধতি নিয়ে কিছু না বললে বোধহয় কিছু কম থেকে যাবে। জে.সি.আই. পূর্ব নির্ধারিত একটি দামে পাট কেনা বেচা করে, যা উন্নত মানের পাট চাষের পরিপন্থী। কারণ সেই নির্ধারিত দামে উচ্চ মানের পাট বিক্রি করতে পাট চাষীরা বিশেষ উৎসাহিত হয় না। ফলতঃ এন জে এম সি মিলগুলি উন্নতমানের কাঁচা পাট বিশেষ পায় না।

৩। পাট শিল্পের একটি দিক যেমন পাট চাষ, তেমনি আর একটি দিক হল কারখানা। এই কারখানার প্রধান সমস্যা হল আধুনিকীকরণ। যেটুকু আধুনিকীকরণ এই শিল্পে হয়েছে, তা হয়েছে ষাটের দশকে- স্পিনিং এবং নন-স্পিনিং এর ডিপার্টমেন্টগুলিতে। অন্য ক্ষেত্রগুলিতে প্রায় হয় নি। আধুনিকীকরণে সরকার কিছু কিছু প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে নিয়েছে। যেমন একটা প্রচেষ্টা হল ১৯৭৬-এ আই ডি বি আই এর সফট লোন প্রকল্প। বাস্তবে মাত্র ৬ কোটি টাকা লোনের গ্রাহক পাওয়া গিয়েছিল।[২৯] কারণ, যে কোনো সহজ লোনের সঙ্গেই কিছু বিশেষ শর্ত থাকে। কিন্তু মিল মালিকেরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। এরপর ১৯৮৬-এর নভেম্বরে আর একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়- এই সময়ে মডার্নাইজেশন ফান্ড তৈরি করা হয় প্রায় ১৫০ কোটি টাকার। এই ফান্ড থেকে ১৪টি মিলে ৫৭.২৯ কোটি টাকা লোন অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিতরিত হয় মাত্র ৮.৯ কোটি টাকা। এই ফান্ডের আভ্যন্তরীণ কাঠামোটির

কিছু বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা প্ল্যান্ট ও মেশিনারী আধুনিকীকরণের জন্য; ৩০ কোটি টাকা রাখা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাল পরিচালিত মিলগুলির জন্য, ২০ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের দেয় টাকার জন্যে এবং মাত্র ৬% সুদে।[৩০] এই প্রকল্পটির পরিচালক আই.এফ.সি.আই- কে ভর্তুকি দেওয়ার দায়িত্ব নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

উপরোক্ত সরকারি প্রচেষ্টাগুলি ছাড়াও সরকার ১৯৮৭-তে Jute Packing Material Compulsory Use in Packing Commodity Act চালু করে।[৩১] এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক চট ও চটজাত থলের ব্যবহার চালু করে, খাদ্যশস্যের ও চিনির ক্ষেত্রে ১০০%, সিমেন্ট ও সারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০% ও ৫০ শতাংশ। সিমেন্ট ও সারের শিল্পে অবশ্য এই আইন লঙঘন করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সরকারি ভূমিকা এই ক্ষেত্রে দুর্বল। এছাড়াও অন্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে আছে আমদানি শুল্ক ছাড় দেওয়া, পাটজাত পণ্যকে উৎপাদন শুল্কের বাইরে রাখা। এর বাইরে আছে সরকারি ক্রয় যার পরিমাণ মোট উৎপাদিত স্যাকের ৩০ শতাংশ।[৩২] অবশ্য এই ক্ষেত্রে একটি প্রধান ত্রুটি হল সারা বছর ধরে অর্ডার না দিয়ে বছরে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় সব অর্ডার দেওয়া- যা পাটকলগুলির পক্ষে অল্প সময়ে যোগান দেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্বায়ন: পুঁজির সঞ্চয়ন ও নয়া উদারবাদের জয়যাত্রা

"Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30"- র রিপোর্টে বলা হয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে পাটের উৎপাদন ছিল বাংলার প্রায় একচেটিয়া। সমগ্র উপমহাদেশের প্রয়োজন মিটিয়ে যে পাট ও চট রপ্তানি হতো তা থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ভারত বাণিজ্যিক খাতে মোট যত বৈদেশিক মুদ্রা পেতো তার অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ ছিল।[৩৩] কিন্তু বাংলার পাটচাষী প্রায় দেনায় ডুবে থাকতো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলি থেকেই মফ:স্বলের পাটের বাজারে মাড়োয়ারী আড়তদার প্রভৃতি ভিড় জমাতো। পাটের ব্যবসার একটা বড় অংশ মাড়োয়ারীদের দখলে চলে যায়। ইংরেজদের চটকলগুলো ইংরেজ কোম্পানির কাছ থেকে পাট কিনতো, সরাসরি ভারতীয়দের কাছ থেকে কিনতো না। ইংরেজ কোম্পানি মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে এবং নিজেরা মফঃস্বলের বাজার থেকে কিনে মিলকে সরবরাহ করতো। দালালের দালাল ভূমিকা ছিল মাড়োয়ারীদের। মিল পাটচাষীদের নানাভাবে ঠকাতো। বিভিন্ন রকম মাপ ছিল, সেটা ঠকাবার একটা কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তা ছাড়া পাটকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা হতো। মিলগুলো অনেক সময় প্রথম শ্রেণীর পাটকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করে পাটচাষীদের কয়েক কোটি টাকা ঠকাতো।

জন গ্যালাগার প্রমুখ অনেকে বলেছেন যে, যে পাটের দামের উপর অসংখ্য বাঙালী কৃষকের জীবন নির্ভর করতো তা নিয়ন্ত্রিত হত কলকাতার বড়বাজার থেকে। সেখানে পাটের দাম নিয়ে ফাটকাবাজি হত এবং দাম যথাসম্ভব কমানো হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক বছরের মধ্যে পাটের দাম আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগেরও কম হয়ে যায়।[৩৪] অন্যদিকে যুদ্ধের কল্যাণে পাটের চাহিদা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায় এবং য়ুরোপীয় চটকল মালিকরা ও মাড়োয়ারী মুৎসুদ্দিরা আকাশছোঁয়া মুনাফা করে। যুদ্ধের সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এই মুৎসুদ্দিরা। কাপড় ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ১৯১৮-এর মধ্যে তাদের কল্যাণে দ্বিগুণ হয়। মাড়োয়ারী সমাজের ঐতিহাসিক বালচাঁদ মোদি লিখেছেন, যুদ্ধের বছরগুলোতে বড়বাজারের উপর

ধনসম্পদ বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হচ্ছিল। বিড়লাদের সম্পদ এই চারবছরে চারগুন বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধের পরের বছর গুলিতে য়ুরোপীয় ও মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররা চেষ্টা করে পাটের দাম যত কমানো যায়। পাবনা, রংপুর প্রভৃতি জেলায় মাড়োয়ারী দালালরা আগামী ফসলের উপর চাষীদের দাদন দিতে এগিয়ে আসে। অর্থের একান্ত প্রয়োজনে চাষীরা এই দাদন নিতেন এবং পাট উঠলে সেটা জলের দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতেন।[৩৫]

পঞ্চম অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প এক গভীর বিপন্নতায় আক্রান্ত। প্রত্যেকদিনই খবরের কাগজ খুললেই চটকল বন্ধের খবর পাওয়া যায়। হাজার হাজার জুটমিল শ্রমিক তাঁদের আইনি প্রাপ্য পাচ্ছেন না। জুটমিলের মালিকরা ক্রমাগত তাদের লোকসানের গল্প তৈরি করে শ্রমিকদের সঠিক পাওনা আত্মসাৎ করে চলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। পাটকল মালিকরা ভারত সরকারের কাছ থেকে চটের বস্তা বানানোর বরাত বা অনুমোদন পায়। এই চটের বস্তা তৈরির অর্থমূল্য কি হারে দেওয়া হবে সেটিও ভারত সরকার ঠিক করে দেন। এই মূল্যের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন এবং অন্যান্য আইনি আর্থিক সুবিধার হিসেবও ধরা থাকে। এক্ষেত্রে অবসরের পর শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা না দেয়ার একটাই অর্থ করা যায় যে পাটকল মালিকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বেআইনি ভাবে বঞ্চিত করছে। এমনকি সুকৌশলে শ্রমিকদের অবসর সংক্রান্ত সামাজিক সুরক্ষার বিধি এড়াতে মালিকরা ঠিকা কর্মী ও চুক্তি-ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করছে। উদ্দেশ্য একটাই যে এই ধরণের অস্থায়ী শ্রমিকদের বেলায় অবসর সংক্রান্ত দেনা-পাওনার কোন ঝক্কি নেই।

রাজ্যের চটকলের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে চন্দননগরস্থিত আইন সহায়তা কেন্দ্র, সবুজের অভিযান ও পরিবেশ আকাদেমি বিভিন্ন সময়ে মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ রাজ্যের ও কেন্দ্রের শ্রমমন্ত্রীর কাছে চটশিল্পের সঙ্কটের কথা জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। কিন্তু কোন সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে আচমকাই প্রশাসনিক মহলে কথাবার্তা শুরু হয়েছে এবং এমনকি শাসকদলের সাংসদদের মুখেও উদ্বেগের কথা শোনা যাচ্ছে! জুটমিল এবং জুটমিল শ্রমিকদের নিয়ে প্রতিশ্রুতি কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কাজের কাজ কিছুই হয়না! শাসকের এই উদাসীনতা এবং উত্তরহীনতার কারণে কি আন্দোলন থেমে থাকবে? এই প্রশ্ন আজ পশ্চিমবঙ্গের ৮০ লক্ষ মানুষের কাছে এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা।[৩৬] হয়তো এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই উঠে আসবে এক নতুন ভাবনা যে ভাবনা হয়তো আজ

ছোট আকারে দিকচক্রবালে দেখা দিয়েছে, এই ভাবনাই হয়তো আগামীদিনে নতুন আন্দোলনের সংকেত বহন করে আনবে।

চটশিল্পের বিপন্নতা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা কেবলমাত্র শ্রমিক বা কৃষকের দায়িত্ব নয়। পাটচাষে যেমন ৪০ লক্ষ কৃষক এবং ২ লক্ষের বেশি শ্রমিক জড়িত ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই শিল্প। প্রত্যেকটি জুটশিল্পে ম্যানেজার থেকে সুপারভাইজার সহ কেরানীর সংখ্যা কমপক্ষে ৭৫ থেকে ১০০ জন।[৩৭] এই পাটচাষ এবং চটশিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট বড় ব্যবসায়ী শ্রেণী যাদের মূল ক্রেতা চটশিল্পের শ্রমিক এবং পাটচাষীরা। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পাটচাষ ও চটশিল্প এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিল্পকে ঘিরে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় এবং যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উত্তরণ ঘটে আর সেই উত্তরণের অংশীদার প্রান্তিক চাষী, সর্বহারা শ্রমিক তথা মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবক সহ ছোট বড় অসংখ্য ব্যবসাদার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়বস্ত হল পাটশিল্পের এই বিপন্নতা নিয়ে শ্রমিকরা কমবেশি চিন্তিত হলেও কৃষকরা সেইভাবে চিন্তিত নয় কারণ তারা পাটচাষের জমিতে অন্য ফলন করতে অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সবথেকে বেশি সংকট ঘনীভূত হচ্ছে শ্রমিক সহ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পাটশিল্পকে ঘিরে গড়ে ওঠা ব্যবসায়ীদের জীবন। স্বাধীনতার পরে জুটশিল্পের ইতিহাসে ক্রমান্বয়ে বিপন্নতা বাড়ছে বিশেষ করে ১৯৮০-র দশক থেকে পাটশিল্পের সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। জুটমিল বন্ধ হবার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক আক্রান্ত হল। দু-একটি ছোটখাট মিছিল হলেও পশ্চিমবঙ্গের বুকে তেমন কোন আন্দোলনের ঝড় উঠল না। এমন একটা মনোভাব যেন বিষয়টি খুবই তুচ্ছ। এই আন্দোলন বিমুখতা গণতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার পক্ষেও অশনিসংকেত।[৩৮] বিকাশ মানে কেবলমাত্র ভোটদান নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাবনা ও তার প্রকাশই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি বিশেষ চরিত্র। গণতান্ত্রিক প্রকাশ জন্ম দেয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আর তারই গর্ভে জন্ম নেয় প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ।

তথ্যসূত্র

১) Bagchi, Amiya & Benerjee, Nirmala. Change and Choice in Indian Industry. Kolkata, 1981.

২) Basu, Nirban. The Working Class movement: A Study of jute mills of Bengal, 1937 – 1947, Kolkata, 1994.

৩) Chakrabarty, Dipesh. Rethinking Working class History: Bengal 1890 -01940. Kolkata, 1989.

৪) Ghosh, Parimal. Communalism and Colonial: Experience of Calcutta Jute Mill Workers 1880-1930. Kolkata, 1990.

৫) Das, Amal. Urban politics in an Industrial Area (Aspects of Municipal and Labour politics In Howrah – West Bengal 1850 – 1920)

৬) Dasgupta, Ranajit. Labour and Working Class in Estern India Studies in Colonial History, Kolkata, 1994.

৭) Gupta, Indrajit. Capital and Labour in Industry: AITUC, Publication, 1953.

৮) Bagchi, Amiya Kumar. *''Private Investment in India 1900-39'' Cambridge University press, London 1972, ''Economy, Society, and Polity: Essays in the Political Economy of Indian Planning''.* Calcutta: Oxford University Press, 1988.

৯) Banerjee, N. *The Unorganized Sector and the Planner.* Calcutta: Oxford University Press, 1978.

১০) Boyce, J.K,. "Jute, Polypropylene, and the Environment: A Study in International Trade and Market Failure,." *The Bangladesh Development Studies, Vol. 33(1-2),*, 1995.

১১) Chakraborty, Chandan,. "Jute Industry On The Way To Recovery From Technological Stagnation, What Awaits Jute Growers In Bengal vol. U5 (29) 1997, PP-13,." *New Age Vol 46(12),*, 1998: PP-4.

১২) Chattopadhyay, Sarat Chandra. *Mahesh .* Calcutta: Sarat Sahitya Sangraha volume 1, 1988.

১৩) Chaudhari, Sudhakar K And Agrawal, Sarvesh C,. "Economics Implications of Jute Cultivation of Case Study of West Bengal,." *India Ground of Agriculture Economics, Vol 47(3).*

১৪) Dutta, Ruddar,. "New Textile Policy Anti SSI,." *New Age Vol.48(53),*, 2000: PP-8.

১৫) Fernandes, Leela,. *Producing Workers The Politics of Gender Class And Culture In Calcutta Jute Mills,.* New Delhi : Vistaar publisher, 1999.

১৬) Ghosh, Parimal. *Colonialism, Class and History of the Calcutta Jute Millhands 1880-1930.* Chennai: Orient Longman Limited, 2000.

১৭) Guha, Dr Srabani. *Agricultural Statistics at a Glance.* 2020. https://www.agricoop.nic.in/.

১৮) Omkar, Goswami. *Collaboration and Conflict: European and Indian Capitalists and the Jute Economy of Bengal, 1919-39, .* IESHER XIX (2), 141, 1982.

১৯) Patnaik, K.M,. *Rural Industrialisation, .* Calcutta: Kitab Mahal, 1988.

২০) Prakash, Gyan. *Can the 'Subaltern' Ride? A Reply to O'Hanlon and Washbrook, Journal of Comparative Studies in Society and History, 34(1).* Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

২১) Said, Edward W. *Orientalism.* New York: Pantheon Books, 1978.

২২) Saptharishi, L.V. *Indian Jute Vision For The Future.* New Delhi: Contact Communication, 1996.

২৩) Sen, Samita. *Women and Labour in Late Colonial India The Bengal Jute Industry .* Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

২৪) Sharma, Vijay Paul. *Price Policy for Jute 2021-22 Season.* Annual, New Delhi-110 001: Commission for Agriculture Costs and Prices Department of Agriculture, Cooperation Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Krishi Bhawan,, 2020 October.

২৫) Thorner, Alice. "Semi-Feudalism or Capitalism? Contemporary Debate on Classes and Modes of Production in india."*Economic and Political Weekly,17* (Economic and Political Weekly, 17, (50), 1982: 50.

২৬) Vyas, Mamta,. "Higher Cost of Production of and Its Jute Industry." *Monthly Commentary on Indian Economic Conditions Vol 47 (7),* 1999: PP-30-32.

২৭) বসু, নির্বাণ। 'স্বাধীনতার প্রাক্কালে টাটানগরের শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৫-৪৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১।

২৮) বসু, নির্বাণ। 'সুর্যোদয়ের শিল্প ও শ্রমিক আন্দোলন : প্রাক-স্বাধীনতা বাংলার ঔষধি ও রাসায়নিক শিল্পের একটি প্রতিবেদন'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৩। কলকাতা, ১৯৯৯।

২৯) বসু, নির্বাণ। 'প্রাক-স্বাধীনতা কলকাতার একটি গণকর্তৃক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন : ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন- একটি সমীক্ষা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৯। কলকাতা, ১৯৯৪।

৩০) বসু, নির্বান। 'রানীগঞ্জের শ্রমিক আন্দোলন : একটি বিশিষ্ট অধ্যায় (১৯৩৮-১৯৩৯)'।

৩১) বসু, নির্বান। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রাক-স্বাধীনতা বাংলার শ্রমিক আন্দোলন'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৫। কলকাতা, ১৯৯০।

৩২) বসু, নির্বাণ। কলকাতার কারখানার বহির্ভূত শ্রমিকের আন্দোলন : একটি বিস্মৃত অধ্যায় (১৯৩৭-৪০)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৪। কলকাতা, ১৯৮৯।

৩৩) বসু, নির্বাণ। 'বাংলার চটকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট (১৯৩৭)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৩। কলকাতা, ১৯৮৮।

৩৪) বসু, নির্বাণ। 'সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্প শ্রমিক আন্দোলন'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১। কলকাতা, ১৯৮৬।

৩৫) পালিত, মধুচ্ছন্দা। 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বঙ্গনারী'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৩। কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৬) দাগুপ্ত, রণজিৎ। 'শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১০। কলকাতা, ১৯৯৫।

৩৭) দাস, কিশোরকুমার। 'আধূনিক ভারতে প্রথম ধর্মঘট – একটি সমীক্ষা'। ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮। কলকাতা, ২০০৪।

৩৮) দাস, অমল। 'ভারতবর্ষের শ্রমিক ইতিহাসের বর্তমান সংকট ও সম্ভাবনা'। ইতিহাস অনুসন্ধান – ২৩। কলকাতা, ২০০৯।

৩৯) দাস, অমল। 'সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা'। ইতিহাস অনুসন্ধান – ১৫। কলকাতা, ২০০১।

৪০) দাস, অমল। 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০ –এর দশক থেকে ১৯৯০ –এর দশক)'। ইতিহাস অনুসন্ধান-৯। কলকাতা, ১৯৯৪।

৪১) দাস, অমল। ' হাওড়ার লাডলো চটকলে শ্রমিক আন্দোলনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (১৯৮১)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৫। কলকাতা, ১৯৯০।

৪২) দাস, আমল। 'বাংলার চটকলের প্রযুক্তিকরন ব্যবস্থা ও শ্রমিকের ওপর তার প্রতিক্রিয়া (১৯২৬-১৯৩০)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৪। কলকাতা, ১৯৮৯।

৪৩) দাস, অমল। 'চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারী প্রভাব (১৮৭৫-১৯২০)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১। কলকাতা, ১৯৮৬।

৪৪) চন্দ, অমিতাভ।'বঞ্চিত মানুষ, অলীক স্বাধীনতা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : ১৯৪৮-১৯৫০ : অসফল বিপ্লব প্রয়াস'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৭। কলকাতা, ২০০৩।

৪৫) চ্যাটার্জি, সুপর্না। 'স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শ্রমিক আইনের আলোকে চা বাগানের মহিলা শ্রমিক (১৯৪৭-১৯৭৭)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৭। কলকাতা, ২০০৩।

৪৬) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'সুকুমারী চৌধুরী ও বেঙ্গল ল্যাম্প'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৭। কলকাতা, ২০০৩।

৪৭) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'চটকলে মেয়ে শ্রমিকরা : ৭০ বছর আগে পরে'।ইতিহাস আনুসন্ধান-৭। কলকাতা, ২০০৯।

৪৮) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৩৪) ও কমিউনিস্ট নেত্রী সুধা রায়'। ইতিহাস আনুসন্ধান-৩। কলকাতা, ১৯৮৮।

৪৯) চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু। 'বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম মহিলা সংগঠকরা – কিছু প্রশ্ন'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১। কলকাতা, ১৯৮৬।

৫০) ঘোষ, অমিয়। 'প্রবর্তক জুটমিল লি. : একটি স্বদেশী শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা (১৯৩৫-১৯৪১)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-১৫। কলকাতা, ২০০১।

৫১) গুহরায়, সিদ্ধার্থ। 'কলকাতা ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : প্রথমযুগ (১৯২৭-১৯৩৯)'। ইতিহাস আনুসন্ধান-। কলকাতা, ১৯৮৮।

৫২) রায়, রণজিৎ। ১৯৭৭/৮৩। ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতাঃ নিউ এজ পাব. প্রা. লি.

৫৩) বসু, সমরেশ। ১৯৮৮। "শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে"। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯

৫৪) বসু, নির্বাণ। ২০১৩। অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, সেতু যৌথ উদ্যোগ। কলকাতা ৯

৫৫) বসু, অজিত নারায়ন। "পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি"। নাগরিক মঞ্চ (প্রকাশক) পরিবেশ সাহিত্য সংসদ। কলকাতা – ২০০৩।

৫৬) চক্রবর্তী, অনাদি। ২০০৩-২০০৪। "শাসক শ্রেণীর আক্রমণ ও শ্রমিক আন্দোলন সমস্যা" কুলিশ, ১:৪। কলকাতা

৫৭) দাস, শংকর। (সাল অনুল্লেখিত)। পাটশিল্পঃ আগ্রগতি না মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি? প্রথম পর্ব। ১২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট। কলকাতা-৯

৫৮) রায়, রবি (সম্পা.)। ১৯৯৪। কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন কোন পথে? কলকাতাঃ সার্চ।

PROFESSOR
Department of International Relations
Jadavpur University
Kolkata – 700 032